ভূ-সম্পদের বিত্তহরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

THE ROBBERY OF THE SOIL

ইংরেজি মূলপাঠ, অনুবাদ এবং আলোচনাসহ

SKM-590

ভূ-সম্পদের বিত্তহরণ

THE ROBBERY OF THE SOIL

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

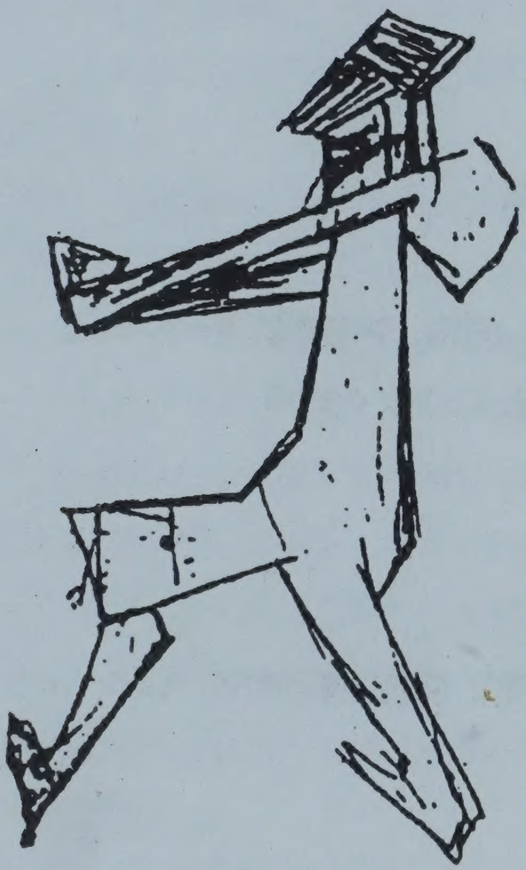

ভূমিকা ও সম্পাদনা: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তমন

ভূ-সম্পদের বিত্তহরণ
THE ROBBERY OF THE SOIL
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা ও সম্পাদনা
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০০৬

প্রকাশক
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
মুক্তমন
৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন নং (০৩৩) ২১১৫ ০৭৩৪

অক্ষরবিন্যাস
রচয়িতা
১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রণ
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ এবং নামপত্রের ছবি : রবীন্দ্রনাথের আঁকা

৩০ টাকা

ভূমিকা

'দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল'— রবীন্দ্রনাথের এই ইংরেজি রচনাটি এবং তার কিছু অংশের বাঙলা অনুবাদ যে আমরা একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করতে চলেছি, তার কারণ এই নয় যে, রচনাটি একেবারে দুষ্প্রাপ্য। তবে এইভাবে স্বতন্ত্র আকারে রচনাটি সম্ভবত আগে প্রকাশিত হয়নি।

আমাদের কাছে রচনাটির প্রধান তাৎপর্য অবশ্য বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা। রবীন্দ্রনাথ জমি নিয়ে দস্যুবৃত্তি বা 'রবারি'-র কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: গ্রামের ভূ-সম্পদকে শোষণ করেই গড়ে উঠছে নগর। আজ পশ্চিমবঙ্গে, এবং সারা দেশেও, এই দস্যুবৃত্তিটা আমরা বড়ো নিষ্ঠুর আকারে দেখতে পাচ্ছি। চাষের জমি বুজিয়ে, প্রাণস্পন্দিত ধানগাছকে মাটি চাপা দিয়ে সেখানে গড়ে উঠছে নগরী। কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনাও রূপায়ণের পথে। 'পুকুর চুরি' কথাটি এখন আক্ষরিক অর্থেই সত্য। জমিজলা বুজিয়ে তার ওপর নির্মিত হচ্ছে সুরম্য অট্টালিকা, বিশাল আবাসন।

এই দস্যুবৃত্তির পরিণাম কী হতে পারে, আজ থেকে আশি বছরেরও আগের একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ওই রচনাটি ছিল একটি সতর্কভাষণ। বর্তমান সময়ের এই দস্যুতস্করশাসিত সমাজে আমরা রচনাটি ফিরে পড়তে চাইছি। আমরা দেখতে চাইব, আজ থেকে আট দশক আগে ভূ-সম্পদ অপহরণের

এই প্রবণতা, গ্রামীণ পরিবেশের অবনতি, শহর-গ্রাম সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছিলেন এবং আজকের দিনে— পরিবেশ যেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতর্কের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে, সেখানে ওই রচনাটির গুরুত্ব কতখানি।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই পুরো রচনাটি অনুবাদ করা সম্ভব হল না; তবে সঙ্গে মূল ইংরেজি রচনাটি থাকায় পাঠকের অসুবিধা হবে না, আশা করি। এল্‌মহার্স্টের একটি ভাষণের সামান্য অংশের বাঙলা অনুবাদও আমরা সংযোজন করেছি। আশা করি, মূল ইংরেজি রচনাটি পাঠক পড়ে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটির উপলক্ষ বা পটভূমি হয়তো অনেকেরই জানা আছে। তবু একবার সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দিই:

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁর গ্রাম পুনর্গঠন প্রকল্পে যোগ দিতে শান্তিনিকেতনে এলেন লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট নামে এক ব্রিটিশ যুবক— কবির সঙ্গে তাঁর আগেই আলাপ হয়েছিল আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে। শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুল গ্রামে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হল পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে, গড়ে উঠল আর-একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান: 'শ্রীনিকেতন'। বলা যেতে পারে, এল্‌মহার্স্টই ছিলেন তার প্রধান স্থপতি; সঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের পরামর্শ তো ছিলই; এ-ছাড়া ছিলেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্র। প্রাথমিক পর্বে প্রয়োজনীয় অর্থের পুরোটাই দিয়েছিলেন এল্‌মহার্স্টের প্রেয়সী এবং পরে পত্নী ডরোথি স্ট্রেট।

প্রথম কয়েক দিন এল্‌মহার্স্ট তাঁর সহযোগীদের নিয়ে সুরুল আর তার আশপাশের গ্রামগুলি ঘুরে দেখলেন। তাঁদের এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের অবক্ষয়ের কারণগুলি খুঁজে বের করা, যাতে তাঁরা পুনরুজ্জীবনের একটি প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। এরপর

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এল্‌মহার্স্ট তাঁর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি ভাষণ দেন কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে, ২৮ জুলাই ১৯২২। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনবদ্য সেই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল: 'দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল'। তবে শান্তিনিকেতনের আশ্রম পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩২৮ব) প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখছি, এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন) শান্তিনিকেতনেও এল্‌মহার্স্ট ওই একই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আশ্রমপত্রিকায় তার শিরোনামের চমৎকার বাঙলা করা হয়েছিল: 'ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত অপহরণ', ভাষণের সারাংশও ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এল্‌মহার্স্টের কলকাতা বক্তৃতাটি পরে প্রকাশিত হয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯২২)। সেই মুদ্রিত ভাষণ আর ওই একই বিষয়ে, একই নামে রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজি রচনা একত্রে পাওয়া যাবে এল্‌মহার্স্টের 'পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান' গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, ১৯৭৫)। এই পুস্তিকায় আমরা প্রথমে ওই দুটি রচনার অংশবিশেষ বাঙলা সারানুবাদে প্রকাশ করছি।

এল্‌মহার্স্টের ভাষণটির প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত-কৃত সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ 'মাটির ওপর দস্যুবৃত্তি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২৯ব)। এল্‌মহার্স্টের বক্তৃতা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-অভিভাষণ পাঠ করেন, তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'পল্লীপ্রকৃতি' সংকলনে (পৃ. ১১৭-১২২)। কলকাতা বক্তৃতার আগে রবীন্দ্রনাথ যে-ভূমিকা করেছিলেন, সেটা পাওয়া যাবে এল্‌মহার্স্টের 'পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে। রবীন্দ্রনাথের যে-ইংরেজি রচনাটির আংশিক অনুবাদ এখানে আমরা প্রকাশ করছি, তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'-র অষ্টম খণ্ড থেকেও এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানতে পারিনি।

'ভূসম্পদের বিত্তহরণ': রবীন্দ্রনাথের একটি সতর্কভাষণ

আধুনিক সভ্যতায় জীবনযাত্রার মান আমাদের গড়পড়তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উন্নীত হয়েছে। এর অব্যবহিত পরিণাম আমাদের দৈহিক এবং মানসিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে; আমাদের শক্তি বা উদ্যমের (এনার্জি) গুণে উৎপাদনের গতিও ত্বরান্বিত হয়েছে। এর ফলে যে-সব কর্মবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে, তারা নিজেদের (শক্তিমত্ততাকে) প্রকাশ করে জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করে তোলার ভেতর দিয়ে।

এই মান যখন সাধারণের থেকে অনেক উঁচু একটা স্তরে পৌঁছে যায়, তখন একটা লোভের ভাবাবেগ প্রবুদ্ধ হতে থাকে। এক সময় যা সমাজের একটা ছোট অংশের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল, সেই (লোভ) — উচ্চস্তর জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ— তখন ব্যাপক এবং বিস্তৃত হয়ে ওঠে। যে-সভ্যতা মানুষের এই আত্ম আহ্লাদ-প্রবণতাকে (সেল্ফ-ইনডাল্‌জেন্স) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেই সভ্যতার পক্ষে এর চাপ মারাত্মক হতে বাধ্য।

আমাদের অর্থনৈতিক জগতের ভূমণ্ডলে ভাগ্যবৈষম্যের কারণে যে-উচ্চবচতা দেখা যায়, তার মাত্রাটা যদি পরিমিত হয়, তবেই কেবল তাকে স্বাস্থ্যকর বলা চলে। যে-দেশের পরিসীমা উঁচু উঁচু পর্বতশ্রেণির দ্বারা কেবলই বিভক্ত হয়েছে, সেখানে কোনো বৃহৎ সভ্যতার জন্ম সম্ভব নয়, কারণ সংযোগের স্বভাবধারাকে রক্ষা করাটা সেখানে খুবই

কঠিন। বিশাল সম্পত্তি আর বিলাসভোগ উঁচু পর্বতের মতোই পৃথকীকরণের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এর দ্বারা সমাজে যে-বিভাজন সৃষ্টি হয়, তা ভৌগোলিক সীমানির্দেশের চেয়ে অধিকতর মন্দ।

জীবন যেখানে সহজ সরল, সম্পদ বস্তুটা সেখানে অতিরিক্ত রকম একচেটে হয়ে থাকে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা সেখানে তাদের সামাজিক দায়িত্ব সহজেই স্বীকার করে নিয়ে থাকে। বস্তুত সম্পদ সামাজিক সংযোগের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রণালী হতে পারে। পূর্বকালে ভারতে সম্পদের ওপর জনমতের দাবি থাকত এবং বেশির ভাগ জনহিতকর কাজের জন্য ধনীরাই স্বেচ্ছায় অর্থ দান করতেন। জল সরবরাহ, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি প্রতিপালন করতেন সম্পত্তিবান ব্যক্তিরা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবর্তনা থেকে। এটা (সেকালে) সম্ভব হয়েছিল, কারণ ব্যক্তিগত ভোগ-চরিতার্থতার তখন একটা সীমানির্দিষ্ট মাত্রা ছিল; ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদকে সহজেই সামাজিক দায়িত্বপালনের কাজে লাগানো যেত। এই রকম একটি সমাজে সভ্যতা দাঁড়িয়ে থাকত সম্পত্তির দৃঢ়বদ্ধ ভিত্তির ওপর এবং ধনসম্পদ সৌভাগ্যবানদের আত্মত্যাগের সুযোগ করে দিত।

কিন্তু জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির চরিত্রলক্ষণ বদলে গেছে। সামাজিক সংযোগের প্রশস্তক্ষেত্র যে জনসেবা, তার দ্বার আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সম্পত্তিবানেরা আজ তাদের সম্পদকে যে-বিলাসব্যসনের আকারে প্রদর্শন করে, তা আত্মকেন্দ্রিক। এর থেকে জন্ম নেয় ঈর্ষা, অসেতুসম্ভব শ্রেণি-বিভাজন। অন্যভাবে বললে, সম্পত্তি জিনিসটা হয়ে দাঁড়ায় সমাজশত্রু (অ্যান্টি সোস্যাল)।

সম্পত্তি বা যাকে বলা হয় আর্থিক অগ্রগতি, সেই বিষয়টাই প্রবলভাবে প্রাতিস্বিক। এর অর্জনপদ্ধতির পিছনে কোনো সামাজিক নীতিবোধ নেই, আছে কেবল বিজ্ঞান (শক্তি)। সম্পত্তি এবং তার

অধিকারের প্রক্রিয়া সামাজিক বন্ধনকে চূর্ণ করে সমাজজীবনের প্রাণশক্তিকেই শোষণ করে নেয়। এই নির্বিবেক প্রক্রিয়া সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে— তৈরি হচ্ছে এমন এক শক্তি যা মানুষকে ভুলিয়ে, চাপ দিয়ে অবিহিত কাজ বা সার্বত্রিক সন্ত্রাসের পথে নিয়ে যায়।

অরণ্যের আগুন, যে-জৈব পদার্থ থেকে তার জন্ম, তাকেই ভক্ষণ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেই তার জ্বালানিসমেত সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। লোভ যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে, সে তখন আগুনের মতোই— সমাজের প্রাণশক্তিকেই সে ভক্ষণ করে। এর পরিণতি সমূহ বিনাশ।...

মানবসমাজে স্বাভাবিক অবস্থায় বহু অপচয়ের উপলক্ষ থেকে যায়। সেগুলো উপেক্ষা করলে আমাদের কোনো বড়ো ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে-দুর্বিপাক আজ আমাদের সমাজ আর সম্পদকে গ্রাস করতে উদ্যত, তার ফল বিধ্বংসী, কারণ তা পরিমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে নেই। উদগ্র লোভের এই মারী সভ্যতার সমস্ত আয়তনকে আজ আকীর্ণ করে দিয়েছে। ভোগবিলাসের অতিশয়তাকে আজ আমরা সবাই আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা বলে দাবি করি। আমার ধনী প্রতিবেশী যতটা অপচয় করছে, ততটা করতে না পারলে যেন আমার দৈন্য প্রকাশিত হয়। অমি তার জন্য লজ্জিত বোধ করি।... প্রত্যেকে প্রত্যেককে শেষ সীমা পর্যন্ত কলুষিত হতে প্ররোচিত করে। সুখ-সুবিধার কাঙ্ক্ষিত মাত্রা আজ ক্রমবিবর্ধমান— তা অর্জন করতে গিয়ে যে-শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, বৃদ্ধির অনুপাত তার তুলনায় কম। নিয়ন্ত্রণহীন উৎপাদন আর তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ক্রমাগত উৎরোল— এর দ্বারা এক বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং প্রাণশক্তি অপচয়িত হচ্ছে। সময়ের চাহিদাস্রোতকে আরও স্ফীত করে তোলা ছাড়া তার আর কোনো ভূমিকা নেই। সভ্যতা আজ এক বিরাট ভোগলোভী সমাজের চাহিদা পুরণে নিয়োজিত। যে-অসহিষ্ণুতা অল্প কিছু লোকের মধ্যে থাকলে

সহনীয় হতে পারত, তা আজ বিশাল জনসমাজে সংক্রমিত হয়েছে। এই সর্বায়ত লোভ, যার সংক্রাম আমাদের সকলকে স্পর্শ করেছে— এরই থেকে জন্ম নিয়েছে যত হীনতা, নির্দয়তা, রাজনীতি আর বাণিজ্যে যত মিথ্যাচার— সমস্ত মানবিক বাতাবরণকে তা আজ বিষাক্ত করে দিচ্ছে। যে-সভ্যতা এমন অ-প্রাকৃতিক ক্ষুধায় মত্ত, বাঁচার জন্য তাকে অবশ্যই অগণন মানুষকে সংহার করতে হবে। পৃথিবীর যে-সব দেশে মানুষের মাংসের দাম সস্তা, সেইসব জায়গায় এই কাজটাই করতে চাওয়া হচ্ছে। এশিয়া আর আফ্রিকায় এখন এক বাঁটোয়ারা চলছে, যার দ্বারা সেখানকার স্থানীয় মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-সমৃদ্ধিকে বেচে দেওয়া হচ্ছে— কিছু সম্মানজনক আবর্জনা অবিরাম সরবরাহ করে, কিছু মানুষের তুষ্টিবাতিক (ফ্যাস্‌টিডিয়্যাস) ফ্যাশনকে চরিতার্থ করার জন্য।

বস্তুসম্পদ আর মানসিক সম্পদের অবশোষণের পরিণতি আজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি। পৃথিবীর সর্বত্র আজ একদিকে নগরের বেলেল্লাপনা, (অন্যদিকে) গ্রামের শারীরিক এবং মানসিক রক্তাল্পতা। নগর অনিবার্য কারণেই আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নগর হল শক্তি আর সম্পদের সমাবেশ, এক অতিশয় ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যই যা নিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে; আর এই নিবেশকেই মনে করা হয় সভ্যতার লক্ষণ। সমাজের কিছু লোক যদি চক্রান্ত করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অন্য সমস্ত মানুষকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করে, তাহলে ক্ষুধানিবৃত্তির এই অ-স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিছুতেই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা আত্মহননের প্রক্রিয়া, কিন্তু ক্রমিক অবক্ষয় মৃত্যুতে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমাজের একাংশের এই স্ফীতিকে বেশ বড়ো ঘটনা বলেই মনে হয়। এই প্রক্রিয়া সমাজদেহের ক্ষুধাজীর্ণ স্তম্ভগুলোকে গোপন করে রাখে এবং সম্পদবৃদ্ধির একটা মোহ সৃষ্টি করে, কারণ কয়েকটি অঙ্গ সমগ্র দেহের সম্পদ হরণ করে (রবারি) স্ফীত হয়ে ওঠে।

মানবদেহ বা সামাজিক সংগঠনের জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি হয় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সদস্যদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা আর সহায়তার দ্বারা। আদানপ্রদানের ভেতর সুন্দর ভারসাম্য থাকলে এমন একটি ঐক্যসূত্র গড়ে ওঠে যাকে নিরুদ্ধ করে রাখা কঠিন। এই ঐক্যই হল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য— তার সৃষ্টি হয়েছে নিজের জোরেই। (দৈহিক) স্বাস্থ্য বা (অর্থনৈতিক) সম্পদ এর গৌণ ফল। ক্ষমতার সংকীর্ণ আকাঙ্ক্ষা যখন জীবনের রিপাবলিকে আধিপত্য করতে থাকে, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক বিনিময়ের ভেতর দিয়ে গড়ে-ওঠা স্বরসংগতি তখন ছন্দ হারাতে বাধ্য। একটা সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোভকে যখন অপরিমিত মাত্রায় বাড়তে দেওয়া হয় এবং অন্যের দ্বারা তা প্রবুদ্ধ এবং প্রোৎসাহিত হতে থাকে— তখন পশ্চিমের দেশে যাকে গণতন্ত্র বলে— তার রূপায়ণ আর সম্ভব হয় না। এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অবিরাম সংগ্রাম চলতে থাকে। আপন আকাঙ্ক্ষাপূরণ আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দখল করতে চায়। গণতন্ত্রের তখন একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের আনন্দবিহারের হস্তিবাহন হয়ে ওঠা।

...পৃথিবীতে নদী আছে, সরোবর আছে, সমুদ্র আছে। তাদের অস্তিত্ব শুধু নিজেদের জন্য জল সঞ্চিত করে রাখার প্রয়োজনে নয়। তারা আকাশে বাষ্প পাঠায়, তা থেকে মেঘ সৃষ্টি হয়ে সারা পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। শহরের কাজটাও হবে সেই রকম। শহর সম্পদ এবং জ্ঞানকে সংহত আকারে এবং প্রচুর পরিমাণেই সংগ্রহ করবে, কিন্তু তা কেবল নিজের অস্তিত্বরক্ষার জন্য নয়। নিজেদের বড়ো করে না দেখে শহরগুলির দায়িত্ব হবে সমগ্র সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলা। শহর যেন বাতিস্তম্ভের মতো; সে একটা বাতি ধারণ করে আছে; কিন্তু তার আলোর সঞ্চার নিজের সীমানা অতিক্রম করে যায়। শহর আর গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক উন্নতিসাধনের এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে

পারে যদি সমাজে সহযোগিতা আর আত্মত্যাগের আদর্শ জাগ্রত হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর কোনো লোভ যদি সেই আদর্শকে ছাপিয়ে যায়, স্বার্থান্ধতাই যদি প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে একটা ফাঁক সৃষ্টি হবে এবং সেটা ক্রমশই চওড়া হতে থাকবে। শহর আর গ্রামের সম্পর্ক তখন হয়ে দাঁড়াবে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। এটা এমন এক ধরনের বিকৃতি যখন দেহই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর শেষ মত্যুতে।...

আমাদের কাছে দারিদ্র্যটা তত বড়ো সমস্যা নয়; তার চেয়েও বড়ো সমস্যা হল মানুষের জীবন থেকে সুখশান্তি হারিয়ে যাওয়া। এখনকার দিনে উৎপাদনের অর্থ দাঁড়িয়েছে সম্পদের অনুসন্ধান এবং আহরণ। এই প্রক্রিয়া মানুষকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করে, পৃথিবী থেকে প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে দিয়ে কিছু দিনের জন্য বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদের পাশে সুখ হয়তো তালিকার এক পংক্তিতে জায়গা পাবে না, কিন্তু সুখটাই শেষ কথা। সুখ সৃজনক্ষম— তার নিজের ভেতরেই তার সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাদের লক্ষ্য হল গ্রামের মরা গাঙে সুখের স্রোত বইয়ে দেওয়া। এর জন্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি, কবি-গায়ক-শিল্পী এবং বিজ্ঞানীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। তা না হলে তাদের ভূমিকাটা হয়ে উঠবে পরাশ্রয়ী জীবের মতো। তারা দেশের মানুষকে শোষণ করে যাবে, বিনিময়ে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না।...

আমরা যারা দারিদ্র্য নিয়ে কাজ করতে যাই, তারা কেবল আরও উৎপাদনের কথাই ভাবি। আমরা ভুলে যাই যে, এর দ্বারা বস্তুসম্পদ এবং মানবসম্পদ আরও বেশি করে শোষিত হচ্ছে এবং বিশাল সংখ্যক মানুষকে বঞ্চিত করে অল্প কিছু লোকের মুনাফা লাভের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কথা হল জীবনকে পরিপুষ্ট করে অর্থ নয়, খাদ্য। ভরা টাকার থলিতে নয়, ভরা জীবনেই আমাদের সুখ। বস্তুগত

সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি বিত্তবান আর নির্বিত্তের বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেবে। সমাজদেহের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না। এই ক্ষতস্থান থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ (শেষ পর্যন্ত) দেহকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

[নির্বাচিত অংশের বাঙলা অনুবাদ। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিকথা' পত্রিকায়। মূল রচনাটির শেষের দিকে এলম্‌হার্স্টের ভাষণের উল্লেখ আছে। তা থেকে বোঝা যায়, ওই ভাষণের সঙ্গে এই রচনার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।— সম্পাদক।]

সংযোজন : এলম্‌হার্স্টের বক্তৃতার পর রবীন্দ্রনাথ যে-অভিভাষণ পাঠ করেন, তা-তে তিনি বলেন : "আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে ধর্ম-উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।" [দ্র. 'পল্লীপ্রকৃতি']

এল্‌মহার্স্টের ভাষণ

পৃথিবীর সমস্ত চোরেদের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়হীন হল শহর। তার চাহিদাপূরণের জন্য, একটা আত্মকেন্দ্রিক সমাজ তৈরি করে অশিক্ষিত জনসাধারণকে দাসত্বে বেঁধে রাখার জন্য শহরের আইন-সংস্কৃতিতে সুকুমারবৃত্তি আর আদর্শের অভাব পুরনো দিনের সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। (সেযুগের) সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অধঃস্তরের শ্রমিক পর্যন্ত সকলেই জনসাধারণের কল্যাণসাধনে নিজেদের নিয়োজিত করত। আজকের দিনে সোনা আর শক্তির দুরন্ত লোভের মুখে পড়ে পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্নতাবোধ আর সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। জমি যা দিতে পারে, তা দেওয়ার সুযোগ তাকে দেওয়া হচ্ছে না। দারিদ্র্য, ব্যাধি, বন্যা, মন্বন্তর আর আদালতের মামলাযুদ্ধ— এই হল আজ গ্রামের দুঃসহ জীবনচিত্র। খাদ্য যেখানে অসম্পূর্ণ আর অপর্যাপ্ত, মানুষের জীবন আর প্রাণশক্তি যেখানে শোষিত হচ্ছে, ম্যালেরিয়ার মশা, মাছি আর (অন্যান্য) ক্ষতিকর জীবাণুদের তা জননক্ষেত্র হয়ে উঠবেই। মজা পুকুর আজ মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেলপথের বাঁধগুলো অ্যানোফিলিস মশার বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে যাচ্ছে। যে-নদী আগে স্বচ্ছসলিল আর নাব্য ছিল, তা আজ পলি পড়ে শুকিয়ে উঠছে। যে-গাছ আগে অনুর্বর মাটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করত শহরে আজ তাদের বাজারমূল্য তৈরি হয়েছে; রেলপথ আর যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিস্তারের নামে আজ তাদের নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে; পুকুরে বালি জমছে,

পড়ে থাকছে শুধু রুক্ষ লাল তপ্ত মরুভূমি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার হল গ্রামের মৃত্তিকাজাত সম্পদ আর মেধাকে অবিরাম চালান দেওয়া হচ্ছে শহরে; আর গ্রামে পড়ে থাকছে অলস, বয়স্ক কিছু ব্যক্তি।...

এল্‌মহার্স্ট অবশ্য তাঁর ভাষণে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পুরনো দিনের গ্রামে সুবর্ণযুগ ছিল এমন মনে করার কারণ নেই; সেই যুগেই আবার ফিরতে হবে এমন দাবিও গ্রাহ্য হতে পারে না। তাঁর প্রস্তাব হল পুরনো দিনের 'সেই সমবায়-জীবনকে আরও শক্ত, সমৃদ্ধ ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করা।' এল্‌মহার্স্ট সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, আমরা যদি কেবল গ্রামকে শোষণই করে চলি, তবে 'ভূমি একদিন আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে।'

সুরুল কৃষিবিদ্যালয়ের বক্তৃতায় সেই কথাটাই এল্‌মহার্স্ট আরও স্পষ্ট এবং তীব্রভাবে বলেন। তাঁর বক্তব্য: আমাদের যাবতীয় ঐশ্বর্য আসে ভূসম্পদের বিত্ত থেকে। কিন্তু এই সম্পদ অসীম নয়। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মূলধনের ওপর কেবলই চেক কাটতে থাকলে এমন একটা দিন আসে, যখন বিত্তের আর বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকে না।[১]

প্রকৃতি আর মানুষ: রবীন্দ্রদর্শন

রবীন্দ্রনাথের রচনায় একথা স্পষ্ট যে, সমাজের শ্রেণিভেদ বা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তিনি এক রকম স্বীকারই করে নিচ্ছেন এবং পূর্বকালে জনহিতকর কাজের জন্য ধনীদের অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্তটি তাঁর কাছে প্রায় আদর্শ হয়ে উঠেছে। গান্ধীজির চিন্তাও ছিল কতকটা এই রকম; তিনি বিশ্বাস করতেন, জমিদাররা প্রজাদের অছি বা ট্রাস্টি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।[২] রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির এই দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর মার্কসবাদীরা শ্রেণি-সমন্বয়ের তত্ত্ব খুঁজে পাবেন এবং অবশ্যই তা সমর্থন করবেন না। তবে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁদের বিচার করতে হবে এমন ফতোয়া কেউ ঘোষণা করলেও আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য নই। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির বিশাল কর্মজীবন এবং বিপুল রচনাসম্ভারের ভেতর থেকে একটি স্বতন্ত্র আদিকল্প বা প্যারাডাইম রচনা করে নেওয়া সম্ভব এবং তার নিরিখেই বিচার করা যেতে পারে রবীন্দ্রদর্শনকে।

প্রাচীন ভারতের গ্রামসমাজে এক বিশিষ্ট সমবায়-প্রথার অস্তিত্ব ছিল, জমিদারের নির্মম নির্যাতন থাকলেও জমিদার-প্রজার মধ্যে এক ধরনের যজমানী সম্পর্ক বিরাজ করত— এটা ইতিহাসের তথ্য; কার্ল মার্কসও তা উল্লেখ করেছেন।[৩] রবীন্দ্রনাথের 'হালদারগোষ্ঠী' বা 'মেঘ ও রৌদ্র'-র মতো গল্প এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য থেকে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত উৎকলন করতে পারি। যেমন গ্রামে পাঠশালাগুলো চলত প্রধানত জমিদার বা কোনো ধনী ব্যক্তির অর্থ-সাহায্যে; মুসলমান বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের কোনো ব্যক্তিও

পাঠশালার গুরুমশাই হতে পারতেন। আমাদের গ্রামসমাজের যত হীনতা আর দীনতাই থাক, এই ঐতিহ্য আমরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। তবে অতিরিক্ত সম্পদ বা ঐশ্বর্য সমাজের একটা ছোট অংশের অধিকারে থাকলে তা কম ক্ষতিকর হয়— রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। প্রথম জীবনে তিনি প্রাচীন ভারতকে একটু বেশি মহিমান্বিত করে দেখতেন— এটাও অস্বীকার করা যায় না। নিজের সাধের বিদ্যালয়কে তিনি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং অচিরেই ব্যর্থ হন— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো রবীন্দ্রানুরাগীও এ-কথা লিখতে কুণ্ঠিত হননি।[৪]

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে, বিশেষত উনিশ শতকে নতুন জমিদারদের চরিত্র বদলে যায়; গ্রামের দিকে মন না দিয়ে তারা আত্মকেন্দ্রিক বিলাসব্যসনেই মত্ত হয়ে পড়ে— এটাও আমাদের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে নথিবদ্ধ আছে। সে-হিসাবে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুব নতুন কিছু বলছেন না; তবে তাঁর দার্শনিক সত্তা এই রূপান্তরের ভেতর থেকে লোভ আর ঈর্ষার একটা তত্ত্বও নির্মাণ করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, সম্পত্তি জিনিসটাই আত্মকেন্দ্রিক এবং এর পিছনে আছে লোভ, ঈর্ষা আর অপরকে শোষণ করে নিজের সম্পদবৃদ্ধির প্রবণতা। মার্কসবাদীরা সম্ভবত এই বক্তব্যে সন্তুষ্ট হবেন, কারণ মার্কসও মনে করতেন, লোভের জন্ম হয় ঈর্ষা থেকে; ঈর্ষাই 'লোভের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে' এবং অপরকে শোষণ করে আপন লক্ষ্য চরিতার্থ করতে চায়।[৫]

তবে রবীন্দ্রনাথের ঈর্ষাতত্ত্ব অবশ্য এইটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না। তাঁর বক্তব্য: ঈর্ষা, উদগ্র লোভ আর অপরিমিত বিলাসের স্পৃহা এক 'নির্বিবেক' প্রক্রিয়া; তা সমাজের প্রাণশক্তিকে শোষণ করে তাকে

ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। শহর কী-ভাবে গ্রামকে শোষণ করে বেড়ে উঠছে, সেই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ (এবং এল্‌মহার্স্টও) বারবার উল্লেখ করেছেন।

এখানে আমরা ভেবে দেখতে পারি 'অস্বাভাবিক লোভস্পৃহা' বা মাটির ওপর 'দস্যুবৃত্তি' বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চান। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, বাঙলায় গোটা উনিশ শতকটাই ছিল কৃষি বিস্তারের পর্ব। ব্যাপক হারে জঙ্গল কেটে, জমি হাসিল করে, নিচু জলাজমি ভরাট করে চাষবাসের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হয়। এর নানা কারণ ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বহু এলাকা জনশূন্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। সেগুলি আবার উদ্ধার করে, জমিকে চাষোপযোগী করে তুলে গ্রাম গঠন করা হয়। ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫-র বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে যারা কিছুটা অধিকার পেয়েছিল, সেই দখলীস্বত্ববান রায়তরাও এই কাজে একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে নিম্নবঙ্গে সরকার সাময়িক বন্দোবস্ত হিসাবে 'লীজ' বা ইজারা প্রথা চালু করে এই শর্তে যে, জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে পারলে প্রথম কয়েক বছর কোনো রাজস্ব দিতে হবে না। এর ফলেও ব্যাপক হারে জমি হাসিল হয়; প্রত্যন্ত উত্তরবঙ্গেও এই প্রক্রিয়াটা ছিল। ইজারাদারদের বলা হত 'লাটদার' বা 'লটদার'। সুন্দরবনের মুখের ভাষায় 'লাট' শব্দটি আজও রয়ে গেছে।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে কোনো আপত্তি ছিল বলে জানা যায় না। ১৯১৮ সালে তাঁকে বরং বলতে শুনি: 'এই মাটিকে প্রয়োজন অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে।... প্রাচীন কালের গ্রাম্যতার গণ্ডির মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।'[৬]... আমরা আরও জানি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। শ্রীনিকেতনে ট্রাকট্‌র চালানো হয়েছে। তারও আগে পূর্ববঙ্গের জমিদারিতে তিনি নতুন নতুন চাষ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন; পুত্র রথীন্দ্রনাথ এর জন্য বিদেশ থেকে বীজও আমদানি করেছিলেন।[৭]

তাহলে রবীন্দ্রনাথ কাকে সমালোচনা করছেন? তাঁর উষ্মার উৎসটি কোথায়?

এর উত্তর, মনে হয়, খুঁজতে হবে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শহর-গ্রাম দুটোই কাছ থেকে থেকেছেন; লক্ষ্য করেছেন, গ্রাম থেকে সৌন্দর্য আর প্রাণশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে; মানুষের আর নতুন কিছু করার উৎসাহ নেই। শান্তিনিকেতনের আশপাশে বীরভূমের গ্রামে এই শ্রীহীন অবস্থাটা আরও বেশি করে সত্য ছিল; কারণ পূর্ববঙ্গের মতো উদ্যোগী স্বাবলম্বী চাষি রাঢ় বাঙলায় তুলনায় কমই ছিল। বিস্তৃত গ্রাম থেকে শ্রী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে— এই মনোবেদনাই ছিল তাঁর শ্রীনিকেতন গঠনের প্রবর্তনা। বহু চিঠিপত্রে এবং 'পল্লীপ্রকৃতি' সংকলনের বিভিন্ন রচনায় প্রকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর সংবেদী কবিমনের সেই যন্ত্রণা। (দ্র. পরিশিষ্ট)

উনিশ শতকে দেশে বিস্তীর্ণ পতিত জমি ছিল। মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই তখন বন কেটে বসত রচনা করতে হয়েছে, জলাভূমিকে ভরাট করে চাষযোগ্য করে তুলতে হয়েছে। জঙ্গল সংরক্ষণ করতে হবে, জলা ভরাট করা চলবে না— আধুনিক পরিবেশবাদের এইসব ধ্বনিকে সেই আমলে প্রক্ষিপ্ত করা ঠিক হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, জমিকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে হবে, তার ভেতর অসংগত কিছু দেখতে পাই না। যুগের প্রয়োজনকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু আহত হয়েছিলেন গ্রামের প্রতি শহরের উদাসীনতায়। ১৯১৭ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩২৪ ব) প্রকাশিত একটি ভাষণে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যাঁহারা পল্লীকে সঞ্জীবিত করিবেন, তাঁহারাই নগরে গিয়াছেন। এই কারণে পল্লী নির্জীব।' পূর্বে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান এতটা ছিল না, সেই একই কথা উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ এবার বেশ তীব্রস্বরেই বলেন, 'দেশের যে-রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে,

তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই যোগাইতেছে।... এই যে তাহাদের ব্যয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছে, তাহার কি কোনো প্রতিদান আমরা করিব?'

প্রতিদানের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সারা জীবন ধরে করে গেছেন, তা আমরা সবাই জানি। নোবেল প্রাইজের পুরো টাকাটাই তিনি জমা রেখেছিলেন পতিসরের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে (১৯১৬, পৃ. ১২৭) রবীন্দ্রনাথের জমিদারির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত ছিল কিনা আমরা বলতে পারব না, তবে পিতার প্রজানির্যাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রে কী পড়ানো হবে সে-বিষয়ে তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখেন (১৯২৯): 'জীবনযাত্রার নানা সমস্যা ওদের কাছে উপস্থিত করে তার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করা চাই।'[৮] পরের বছর সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে, তারপর (অক্টোবর, ১৯৩০) পুত্রকে একটি চিঠিতে জানিয়ে দেন, জমিদারির ওপর 'আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার ওপর অনেককাল থেকেই আমার মনে-মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে।... জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।'[৯]

কেউ বলতেই পারেন, এই ধিক্কার আর লজ্জাবোধ নিয়েও তো রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন জমিদারি চালিয়ে এসেছেন। ঠিকই, তবে একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা তথ্য এখানে পেশ করতে চাই, কারণ এই তথ্যটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে বিশেষ দেখি না। ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশনের কাছে রবীন্দ্রনাথের জমিদারির পক্ষ থেকে যে-অভিমত পাঠানো হয়েছিল, তা-তে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়, সরকার এ-পর্যন্ত গ্রামের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি, সেই দায় বহন করতে হয়েছে জমিদারদের। তবে সরকার যদি ক্ষতিপূরণ দিয়ে এবং 'সঙ্গত উপায়ে' ('ইন এ ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার

ম্যানার') জমিদারি অধিগ্রহণ করতে চায়, ঠাকুর জমিদারির কোনো আপত্তি নেই, তাঁরা বরং এই দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে খুশিই হবেন।[১০]

জমিদাররা গ্রামোন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেছে,— এই বক্তব্যটি অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়; তবে ঠাকুর পরিবার জমিদারি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল, এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ এবং এল্‌মহার্স্টের ক্ষোভের আর-একটি বড়ো বিষয়: গ্রাম-শহরের সম্পর্ক। এল্‌মহার্স্ট যখন বলছেন, শহর হচ্ছে সবচেয়ে বড় চোর, তাঁর চোখের সামনে রয়েছে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংল্যান্ড— যেখানে গ্রামকে ধ্বংস করেই গড়ে উঠেছে নগর। ভারতে শিল্পবিপ্লব হয়নি; কিন্তু ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থায় ভেঙে পড়েছিল গ্রামসমাজের সাবেক কাঠামো— শহর হয়ে উঠেছিল ভূমিস্বত্বভোগীদের ভোগবিলাসের বিনোদনক্ষেত্র। গ্রামের সেই ধ্বংসের বেদনার্ত কাহিনিই আমরা শুনছি রবীন্দ্রনাথের মুখে। তবে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ বা বেদনার একটা বিশিষ্ট চরিত্র ছিল। দারিদ্র্যের চাইতেও তাঁর কবিমনকে বেশি ব্যথিত করত গ্রামের শ্রীহীনতা; এই চিন্তা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠান 'গ্রাম পুনর্গঠন পরিষদ'-এর নতুন নামকরণ করলেন 'শ্রীনিকেতন' (১৯২২)।

আর দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে পীড়া দিত বোধহয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ-সম্পর্কের তত্ত্ব রবীন্দ্রদর্শনের একেবারে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। গানে-কবিতায়-নাটকে-প্রবন্ধে, এমনকী 'অতিথি' বা 'বলাই'-এর মতো ছোটগল্পেও তিনি বারবার এই যোগসূত্রকে আবাহন করেছেন ব্যাকুলস্বরে। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, 'বাহিরের জ্ঞান' আর 'অন্তরের প্রকৃতি' মিলে যে 'অপূর্ব ঐক্য' গড়ে ওঠে, সেটাই 'জীবনের মূলতত্ত্ব';[১১] এবং:

'আমাদের অন্তঃকরণে যত কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই। সত্যকে পাই।'[১২]...

তিনি সাহিত্যের আরাধনা করেন, কারণ: "সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন কারো কারো কাছে মিস্টিক বা কবিমনের রোমান্টিক ভাবনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের নিজের কর্মজীবন। গ্রাম পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে নান্দনিক বোধের সঙ্গে মিশেছিল বৃত্তিশিল্প বা বিকল্প জীবিকার মতো আপাতস্থূল বিষয়গুলিও; গ্রামের মানুষের নিত্য রোগব্যাধি দেখে তিনি কেবল হাহাকারই করেননি 'স্বাস্থ্য সমবায় কেন্দ্র' গঠন করে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কখনও ব্যথিত, কখনও বা ক্রুদ্ধও, কারণ তাঁর আদর্শ যোগসূত্রকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে যে-হন্তারক শক্তি, তা হল লোভ, ঈর্ষা আর অত্যধিক বিলাসস্পৃহা। রবীন্দ্রনাথের অস্ত্র তাই উদ্যত সেই রিপুর বিরুদ্ধে যা নির্বিচার বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়, লোভের বাসনা পূরণ করতে গিয়ে প্রকৃতির সম্পদের অপব্যয় করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে আক্রমণ করছেন সেই মানসতাকে, এখনকার ভাষায় যাকে বলা হয় ভোগবাদ বা 'কনজিউমারিজম্'। বাঁচার প্রয়োজনে মানুষকে বন কেটে বসত বানাতে হবে, চাষজমির আয়তন বাড়াতে হবে; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা আধিপত্য বিস্তারের নয়, এই ইঙ্গিতই আমরা পাই রবীন্দ্রদর্শন থেকে; আর এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও যেন কার্ল মার্কসকেও অতিক্রম করে যান; কারণ মার্কসের রচনায় প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে দেখা যায়। মার্কস স্পষ্ট করেই বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিকে বদলায় আর এই বদলের ভেতর

দিয়ে তাকে করে তোলে মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের অস্ত্র: 'ইনস্ট্রুমেন্টস অফ হিউম্যান ডমিনেশন অফ নেচার অর অফ ইট্‌স অ্যাকটিভিটি ইন নেচার।'[১৫] মার্কস এই প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন, কারণ তাঁর দর্শন বলে, লক্ষ্যসাধনের জন্য মানুষ যা করে, 'সেটাই তার ইতিহাস'।[১৬]

এই চিন্তা রবীন্দ্রদর্শন থেকে স্পষ্টত পৃথক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন কর্তৃত্বে নয়, সহিতত্বে। আজকের পরিভাষায় আমরা যাকে স্থায়ী উন্নয়ন বা 'সাস্‌টেনেব্‌ল ডেভেলপমেন্ট' বলি, সেই তত্ত্বেরই উপক্রমণিকা রচনা করে গেছেন যেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পাঠকসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে শুনি; কিন্তু আজকের পরিবেশতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে বলতেই হবে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথের যে-রচনাটি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা আজ পরিবেশ আন্দোলনের একটি ইশ্‌তেহার হয়ে উঠতে পারে।

মনে পড়ছে, ১৯৯৭ সালে কলকাতায় একটি ভাষণে মেধা পাটকর উদ্ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওই রচনাটির কয়েকটি পংক্তি।

উল্লেখপঞ্জি

১. সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: 'শান্তিনিকেতন', সম্পাদনা: সুপ্তি মিত্র, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮০; পৃ. ৬২।

২. 'দি এসেনসিয়াল রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধি', সম্পাদনা: রাঘবন আয়ার, অক্সফোর্ড ১৯৯১; পৃ. ৪০৮।

৩. 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড। দ্র. কার্ল মার্কস, 'সিলেকটেড রাইটিংস ইন সোসিওলজি অ্যান্ড সোস্যাল ফিলজফি', সম্পাদনা: টি. বি. বটোমর এবং এম রুবেল, (পেলিকান/পেঙ্গুইন, ১৯৭১), পৃ. ১৩০।

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী', বুকল্যান্ড ১৯৬২; পৃ. ৩৮, ৪১-৪২।

৫. মার্কস, 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপট্স অফ ১৮৪৪', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৭; পৃ. ৯৫।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পল্লীপ্রকৃতি', বিশ্বভারতী ১৩৯৩ ব সং; পৃ. ৩৮-৩৯।
৭. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিতৃস্মৃতি', জিজ্ঞাসা ১৪০০ ব সং; পৃ. ১০৭-৮।
৮. 'শিক্ষাসত্র', বিশ্বভারতী ১৯৮৪, পত্রাবলী ৪।
৯. প্রাগুক্ত, পত্রাবলী ৫।
১০. 'রিপোর্ট অফ দ্য ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন, বেঙ্গল'। ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪০; পৃ. ৪৩০। ঠাকুর জমিদারির পক্ষ থেকে প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছিলেন চিফ ম্যানেজার ডি. চ্যাটার্জী।
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী ১৪০৯ ব সং; পৃ. ২২২-২৩।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।
১৪. দেখতে পারেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীনিকেতনঃ রবীন্দ্রনাথস্ পেডাগজি ইন প্র্যাকটিস', মার্জিনস ২০০০।
১৫. মার্কস, পেলিকান সংকলন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৪ ('গ্রুনড্রিসে' রচনার অংশ)।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

THE ROBBERY OF THE SOIL

RABINDRANATH TAGORE

The standard of living in modern civilisation has been raised far higher than the average level of our necessity. The strain which this entails serves at the outset to increase our physical and mental alertness. The claim upon our energy accelerates growth. This in its turn produces activity that expresses itself by raising life's standard still higher.

When this standard attains a degree that is a great deal above the normal it encourages the passion of greed. The temptation of an inordinately high level of living, which was once confined only to a small section of the community, becomes widespread. The burden is sure to prove fatal to the civilisation which puts no restraint upon the emulation of self-indulgence.

In the geography of our economic world the ups and downs produced by inequalities of fortune are healthy only within a moderate range. In a country divided by the constant interruption of steep mountains no great civilisation is possible because in such places the natural flow of communication is always difficult. Like mountains, large fortunes and the enjoyment of luxury are also high walls of segregation; they produce worse divisions in society than any physical barriers.

Where life is simple, wealth does not become too exclusive and owners of individual property find no great difficulty in acknowledging their communal responsibility. In fact wealth can even become the best channel for social communication. In former days in India public opinion levied heavy taxes upon wealth and most of the public works of the country were voluntarily contributed by the rich. The water supply, medical help, education and amusement, were naturally maintained by men of property through a spontaneous sense of mutual obligation. This was made possible because the limits set to the individual right of self-indulgence were narrow and surplus wealth easily followed the channel of social responsibility. In such a society civilisation was supported by strong pillars of property, and wealth gave opportunity to the fortunate for self-sacrifice.

But, with the rise of the standard of living, property changes its aspect. It shuts the gate of hospitality which is the best means of social communication. Its owners display their wealth in an extravagance which is self-centred. This creates envy and irreconcilable class division. In other words property becomes anti-social.

Because property itself, with what is called material progress, has become intensely individualistic, the method of gaining it has become

a matter of science and not of social ethics. Property and its acquisition break social bonds and drain the life sap of the community. The unscrupulousness involved plays havoc the world over and generates a force that can coax or coerce peoples to deeds of injustice and of wholesale horror.

The forest fire feeds upon the living world from which it springs till it exhausts itself completely along with its fuel. When a passion like greed breaks loose from the fence of social control it acts like that fire, feeding upon the life of society. The end is annihilation. It has ever been the object of the spiritual training of man to fight those passions that are anti-social and to keep them chained. But lately abnormal temptation has set them free and they are fiercely devouring all that is affording them fuel.

There are always insects in our harvest field which, in spite of their robbery, tend to leave a sufficient surplus for the tillers of the soil, so that it does not pay us to try to exterminate them altogether. But when some pest, that has an enormous power of self multiplication, attacks our total food crop we must consider this a great calamity. In human society, in normal circumstances, there are many causes that make for wastage, yet it dies not cost us much to ignore them. But today the blight that has fallen upon our social life and its resources is disastrous because it is not restricted within

reasonable limits. This is an epidemic of voracity that has infected the total area of civilisation. We all claim our right, and freedom, to be extravagant in our enjoyment if we can afford it. Not to be able to waste as much upon myself as my rich neighbour does merely prove a poverty in myself of which I am ashamed, and against which my women folk, and other parasites, naturally cherish their own grievance. Ours is a society in which, through its tyrannical standard of respectability, all the members are goading each other to spoil themselves to the utmost limit of their capacity. There is a continual screwing up of the ideal level of convenience and comfort, the increase in which is proportionately less than the energy it consumes. The very shriek of advertisement itself, which constantly accompanies the progress of unlimited production, involves the squandering of an immense quantity of material and of life force which merely helps to swell the sweepings of time. Civilisation today caters for a whole population of gluttons. An intemperance, which could safely have been tolerated in a few, has spread its contagion to the multitude. This universal greed, which now infects us all, is the cause of every kind of meanness, of cruelty and of lies in politics and commerce, and vitiates the whole human atmosphere. A civilisation, which has attained such an unnatural appetite, must,

for its continuing existence, depend upon numberless victims. These are being sought in those parts of the world where human flesh is cheap. In Asia and Africa a bartering goes on through which the future hope and happiness of entire peoples is sold for the sake of providing some fastidious fashion with an endless supply of respectable rubbish.

The consequence of such material and moral drain is made evident when one studies the condition manifested in the grossness of our cities and the physical and mental anaemia of the villages almost everywhere in the world. For cities inevitably have become important. The city represents energy and materials concentrated for the satisfaction of an exaggerated appetite, and this concentration is considered to be a symptom of civilisation. The devouring process of such an abnormality cannot be carried on unless certain parts of the social body conspire and organise to feed upon the whole. This is suicidal; but, before a gradual degeneracy ends in death, the disproportionate enlargement of the particular portion looks formidably great. It conceals the starved pallor of the entire body. The illusion of wealth becomes evident because certain portions grow large on their robbery of the whole.

A living relationship, in a physical, or in a social body, depends upon sympathetic collaboration and

helpfulness between the various individual organs or members. When a perfect balance of interchange begins to operate, a consciousness of unity develops that is no longer easy to obstruct. The resulting health or wealth are both secondary to this sense of unity which is the ultimate end and aim, and a creation in its own right. Whenever some sectarian ambition for power establishes a dominating position in life's republic, the sense of unity, which can only be generated and maintained by a perfect rhythm of reciprocity between the parts, is bound to be disturbed. In a society, where the greed of an individual or of a group is allowed to grow uncontrolled, and is encouraged or even applauded by the populace, democracy, as it is termed in the West, cannot be truly realised. In such an atmosphere a constant struggle goes on among individuals to capture public organisations for the satisfaction of their own personal ambition. Thus democracy becomes like an elephant whose one purpose in life is to give joy rides to the clever and to the rich. The organs of information and expression, through which opinions are manufactured, and the machinery of administration, are openly or secretly manipulated by the prosperous few, by those who have been compared to the camel which can never pass through the needle's eye, that narrow gate that leads to the kingdom of ideals.

Such a society necessarily becomes inhospitable, suspicious, and callous towards those who preach their faith in ideals, in spiritual freedom. In such a society people become intoxicated by the constant stimulation of what they are told is progress, like the man for whom wine has a greater attraction than food.

Villagers are like woman. In their keep is the cradle of the race. They are nearer to nature than the towns and are therefore in closer touch with the fountain of life. They have the atmosphere which possesses a natural power of healing. Like woman they provide people with their elemental needs, with food and joy, with the simple poetry of life and with those ceremonies of beauty which the village spontaneously produces and in which she finds delight. But when constant strain is put upon her through the extortionate claims of ambition, when her resources are exploited through the excessive stimulus of temptation, then she becomes poor in life. Her mind becomes dull and uncreative; and, from her time-honoured position as the wedded partner of the city, she is degraded to that of maid servant. The city, in its intense egotism and pride, remains blissfully unconscious of the devastation it is continuously spreading with the village, the source and origin of its own life, health and joy.

True happiness is not at all expensive. It depends

upon that natural spring of beauty and of life, harmony of relationship. Ambition pursues its own path of self-seeking by breaking this bond of harmony, digging gaps, creating dissension. Selfish ambition feels no hesitation in trampling under foot the whole harvest field, which is for all, in order to snatch away in haste that portion which it craves. Being wasteful it remains disruptive of social life and the greatest enemy of civilisation.

In India we had a family system of our own, large and complex, each family a miniature society in itself. I do not wish to discuss the question of its desirability, but its rapid decay in the present day clearly points out the nature and process of the principle of destruction which is at work in modern civilisation. When life was simple, needs normal, when selfish passions were under control, such a domestic life was perfectly natural and truly productive of happiness. The family resources were sufficient for all. Claims from one or more individuals of that family were never excessive. But such a group can never survive if the personal ambition of a single member begins separately to clamour for a great deal more than is absolutely necessary for him. When the determination to augment private possession, and to enjoy exclusive advantage, runs ahead of the common good and of general happiness, the bond of harmony, which is

the bond of creation, must give way and brothers must separate, nay, even become enemies.

This passion of greed that rages in the heart of our present civilisation, like a volcanic flame of fire, is constantly struggling to erupt in individual bloatedness. Such eruptions must disturb man's creative mind. The flow of production which gushes from the cracks rent in society gives the impression of a hugely indefinite gain. We forget that the spirit of creation can only evolve out of our own inner abundance and so add to our true wealth. A sudden increase in the flow of production of things tends to consume our resources and requires us to build new storehouses. Our needs, therefore, which stimulate this increasing flow, must begin to observe the limitation of normal demand. If we go on stoking our demands into bigger and bigger flames the conflagration that results will, no doubt, dazzle our sight, but its splendour will leave on the debit side only a black heap of charred remains. When our wants are moderate, the rations we each claim do not exhaust the common store of nature and the pace of their restoration does not fall hopelessly behind that of our consumption. This moderation leaves us leisure to cultivate happiness, that happiness which is the artist soul of the human world, and which can create beauty of form and rhythm of life. But man today forgets that the divinity within him is

revealed by the halo of this happiness. The Germany of the period of Goethe was considered to be poverty stricken by the Germany of the period of Bismarck. Possibly the standard of civilisation, illuminated by the mind of Plato, or by the life of the Emperor Asoka, is underrated by the proud children of modern times who compare former days with the present age of progress, an age dominated by millionaires, diplomats and war lords. Many things that are of common use today were absolutely lacking in those days. But are the people that lived then to be pitied by the young of our day who enjoy so much more from the printing press but so much less from the mind?

I often imagine that the moon, being smaller in size than the earth, produced the condition for life to be born on her soil earlier than was possible on the soil of her companion. Once she too perhaps had her constant festival of colour, of music and of movement; her store-house was perpetually replenished with food for her children. Then in course of time some race was born to her that was gifted with a furious energy of intelligence, and that began greedily to devour its own surroundings. It produced beings who, because of the excess of their animal spirit, coupled with intellect and imagination, failed to realise that the mere process of addition did not create fulfilment; that mere size of

acquisition did not produce happiness; that greater velocity of movement did not necessarily constitute progress, and that change could only have meaning in relation to some clear ideal of completeness. Through machinery of tremendous power this race made such an addition to their natural capacity for gathering and holding, that their career of plunder entirely outstripped nature's power for recuperation. Their profit makers dug big holes in the stored capital of the planet. They created wants which were unnatural and provision for these wants was forcibly extracted from nature. When they had reduced the limited store of material in their immediate surroundings they proceeded to wage furious wars among their different sections, each wanting his own special allotment of the lion's share. In their scramble for the right of self-indulgence they laughed at moral law and took it to be a sign of superiority to be ruthless in the satisfaction [of?] each of his own desire. They exhausted the water, cut down the trees, reduced the surface of the planet to a desert, riddled with enormous pits, and made its interior a rifled pocket, emptied of its valuables. At last one day the moon, like a fruit whose pulp had been completely eaten by the insects which it had sheltered, became a hollow shell, a universal grave for the voracious creatures who insisted upon consuming the world into which they had been born.

In other words, they behaved exactly in the way human beings of today are behaving upon this earth, fast exhausting their store of sustenance, not because they must live their normal life, but because they wish to live at a pitch of monstrous excess. Mother Earth has enough for the healthy appetite of her children and something extra for rare cases of abnormality. But she has not nearly sufficient for the sudden growth of a whole world of spoiled and pampered children.

Man has been digging holes into the very foundations not only of his livelihood but of his life. He is now feeding upon his own body. The reckless waste of humanity which ambition produces is best seen in the villages where the light of life is gradually being dimmed, the joy of existence dulled, and the natural bonds of social communion are being snapped every day. It should be our mission to restore the full circulation of life's blood into these martyred limbs of society; to bring to the villagers health and knowledge; a wealth of space in which to live, a wealth of time in which to work, to rest and enjoy mutual respect which will give them dignity; sympathy which will make them realise their kinship with the world of men, and not merely their position of subservience.

Streams, lakes and oceans are there on this earth. They exist not for the hoarding of water exclusively

each within its own area. They send up the vapour which forms into clouds and helps in a wide distribution of water. Cities have a special function in maintaining wealth and knowledge in concentrated forms of opulence, but this should not be for their own exclusive sake; they should not magnify themselves, but should enrich the entire society. They should be like the lamp post, for the light it supports must transcend its own limits. Such a relationship of mutual benefit between the city and the village remains strong only so long as the spirit of cooperation and self-sacrifice is a living ideal in society as a whole. When some universal temptation overcomes this ideal, when some selfish passion finds ascendancy, then a gap is formed and widened between them. The mutual relationship between city and village becomes that of exploiter and victim. This is a form of perversity in which the body becomes its own enemy. The termination is death.

We have started in India, in connection with Visva-Bharati, a kind of village work the mission of which is to retard this process of race suicide. If I try to give you details of the work, the effort will look small. But we are not afraid of this appearance of smallness, for we have confidence in life. We know that if, as a seed, smallness represents the truth that is in us, it will overcome opposition and

conquer space and time. According to us, the poverty problem is not so important. It is the problem of unhappiness that is the great problem. The search for wealth, which is the synonym for the production and collection of things, can make use of men ruthlessly, can crush life out of the earth, and for a time can flourish. Happiness may not compete with wealth in its list of needed materials, but it is final, it is creative, therefore it has its own source of riches within itself. Our object is to try to flood the choked bed of village life with streams of happiness. For this the scholars, the poets, the musicians, the artists as well as the scientists have to collaborate, have to offer their contribution. Otherwise they live like parasites, sucking life from the country people, and giving nothing back to them. Such exploitation gradually exhausts the soil of life, the soil which needs constant replenishing by the return of life to it, through the completion of the cycle of receiving and giving back.

The writer of the following paper, who was in charge of the rural work in Visva-Bharati, forcibly* drew our attention to this subject and made it clear to us that the civilisation which allows its one part to exploit the rest without making any return is merely cheating itself into bankruptcy. It is like the

* forcefully (?)– ed.

foolish young man, who suddenly inheriting his father's business, steals his own capital and spends it in a magnificient display of extravagance. He dazzles the imagination of the onlookers, he gains applause from his associates in his dissipation, he becomes the most envied man in his neighbourhood till the morning when he wakes up, in surprise, to a state of complete indigence. Most of us who try to deal with the poverty problem think of nothing else but of a greater intensive effort of production, forgetting that this only means a greater exhaustion of materials as well as of humanity, and this means giving a still better opportunity for profit to the few at the cost of the many. But it is food which nourishes and not money. It is fullness of life which makes us happy and not fullness of purse. Multiplying materials intensifies the inequality between those who have and those who have not. This is the worst wound from which the social body can suffer. It is a wound through which the body is bled to death!

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশভাবনায় : 'শ্রী'

গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শুরু করেছিলেন পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে, তাঁদের জমিদারিতে। সেটা ১৯০৭-৮ সালের কথা। গ্রামবাসীদের নিয়ে 'মণ্ডলী' গঠন, আকালের দিনে সাহায্যের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং রাস্তা তৈরি আর জঙ্গল পরিষ্কারের মতো কাজের ভেতর দিয়ে গ্রামবাসীদের স্ব-উদ্যোগের একটি দৃষ্টান্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯০৯ সালে বিদেশ থেকে কৃষিবিদ্যার পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফিরলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁর সেই অধীত বিদ্যার প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র হল শিলাইদহ। নতুন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে চাষবাসের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। পল্লীজীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়-চিঠিপত্রে, রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' (১৯৬৬) আর শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৪) গ্রন্থে এইসব কাজকর্মের খণ্ড-খণ্ড চিত্র ধরা আছে।

পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-কাজ শুরু করেছিলেন, নানা কারণে তা খুব ফলপ্রসূ হতে পারেনি। পরে রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মিলে বোলপুরের সুরুলেও কিছু কাজকর্মের চেষ্টা করেন; কিন্তু সে-প্রয়াসও বেশি দূর এগোতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ণ বাসনাই

যেন একটা সংহত রূপ পেল শ্রীনিকেতনে। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় তিনি যে-'আত্মশক্তি'র কথা বলেছিলেন, তারই প্রবর্তনা, সেই চিন্তারই অনুক্রম আমরা দেখতে পাই তাঁর উত্তরকালের পল্লিভাবনায়।

গ্রামের মানুষের অসহনীয় দারিদ্র্যের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই জানতেন। ১৮৯৪ সালের এক চিঠিতে বর্ষায় দুর্গত গ্রামজীবনের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন; 'এত কষ্ট, এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে নাই নে।'[১] ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের ভাষণেও প্রধান বিষয় ছিল গ্রামজীবনের দুর্দশা; 'জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল, তাহা সংরক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তার সংস্কারের কোনো শক্তি নাই...।' রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ঔপনিবেশিক শাসন 'গ্রামসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।'[২]

এই চিন্তারই আরও পরিণত স্বর আমরা শুনতে পাব এল্‌মহার্স্টের সঙ্গে তাঁর আলাপে। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রণা বোধ করছেন এই দেখে যে, গ্রামসমাজ 'ভেঙে পড়ছে'— জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লিভাবনার কেন্দ্রীয় বিষয় তখন: পরিবেশ— হতশ্রী গ্রাম আর তার ছন্নছাড়া জীবন; শুধু অনটন বা বিত্তহীনতা নয়; শ্রীহীনতা, 'অস্বাস্থ্য', 'অসৌন্দর্য'। পরে এই বেদনার কথাই তিনি বার-বার বলবেন শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন সভার ভাষণে এবং অন্যান্য রচনায়।

যেমন, ১৯৩০ সালে শ্রীনিকেতনের এক উৎসবের ভাষণে : 'একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে-পল্লীতে ছিল সঞ্চালিত।...(কিন্তু) এখন তা নেই।' ('পল্লীপ্রকৃতি', পৃ. ৫৯)

ওই বছরেই আর-একটি অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের তিনি মনে করিয়ে দেবেন: 'এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়...কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০)

সেই সাবেকি জীবনধারা, সেই 'সমাজধর্ম' বা 'আত্মীয়সম্বন্ধ' যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যাকে চিহ্নিত করছেন, এখনকার পরিভাষায় আমরা তাকে বলি: ভোগবাদ। রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেছেন 'রিপুশক্তি', কখনও বা 'দানবশক্তি'। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হল: 'কিছু বিলিতি বেগুন, কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক সতরঞ্জ বুনিয়েছি— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়।' বড়ো কথা হল, 'দানবশক্তি'কে আমরা এখনও পরাভূত করতে পারিনি। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪)

দানবশক্তি বা ভোগবাদকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে: 'মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে উঠে।' এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়েও প্রচুর মুনাফা, প্রচুর ফললাভ করা যায়; কিন্তু এটাই 'সভ্যতার চরম বিকাশ নয়।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯)

মানুষের উন্মত্ত লোভ আর ভোগসর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আরও তীব্র হয়েছে 'দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল' রচনায়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সম্পদসঞ্চয় আর পার্থিব উন্নয়নের নামে আজ যা চলছে, তা মানুষের 'সামাজিক সম্বন্ধ'-কে নষ্ট করে সমাজের 'প্রাণশক্তি'-কেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এই 'নির্বিবেক' প্রক্রিয়ায় 'সামাজিক নৈতিকতার' (সোস্যাল এথিক্স) কোন স্থান নেই। এই প্রক্রিয়ায় সমাজে 'ঈর্ষা এবং শ্রেণিভেদের' সৃষ্টি হয়; সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় একটি সমাজগর্হিত বস্তু: 'প্রপার্টি বিকাম্স অ্যান্টি সোস্যাল'।[৪]

ওই রচনার শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বলেন,

তাঁর মতে দারিদ্র্যটাই প্রধান সমস্যা নয়; আরও বড়ো সমস্যা হল সুখবিবর্জিত জীবন। অর্থ বা সম্পত্তি নয়, আমাদের সুখের প্রকৃত উৎস হল 'জীবনের সম্পূর্ণতা' (ফুলনেস অফ লাইফ)। এই সম্পূর্ণতার ছন্দ আজ জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের কাজ হবে গ্রামসমাজে সেই সম্পূর্ণতা ফিরিয়ে আনা, নিরুদ্ধ গ্রামজীবনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে দেওয়া: 'টু ফ্লাড দ্য চোক্ড বেড অফ ভিলেজ লাইফ উইথ স্ট্রীম্স অফ হ্যাপিনেস।'

মনে হতে পারে, আনন্দ আর সৌন্দর্যকেই বড়ো করে তুলে রবীন্দ্রনাথ যেন গ্রামসমাজের এক রোমান্টিক রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। কিন্তু শ্রীনিকেতনের কাজকর্মের খতিয়ানটি সামনে রাখলে দেখা যাবে, অর্থনীতির প্রশ্নটিকে সেখানে একেবারেই অবহেলা করা হয়নি।' ১৯৩৮ সালের একটি অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন: 'আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি।' ('পল্লীপ্রকৃতি', পৃ. ৯৩)

গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে আনন্দ বা শ্রী-কে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ? দুটি কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। বিশ্বজোড়া ধনতন্ত্রের প্রসারে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন মানুষের এক উদগ্র ভোগবাসনা। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার দু-বছর পরেই লেখা হল 'রক্তকরবী'— রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন, বিপুল উপায়ে ('জাইগানটিক মিন্স') সম্পদ সঞ্চয় করে সমাজ অবশেষে তার নিজের গড়ে-তোলা শক্তির হাতে নিজেই বাঁধা পড়ে গেছে; মানুষের প্রাণশক্তি নষ্ট করে দিয়ে তাকে পরিণত করেছে যন্ত্রে।[৫] এরই একটি বিপরীত আদর্শ যেন রবীন্দ্রনাথ রচনা করতে চেয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে, এমন কয়েকটি গ্রাম যেখানে সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা-কীর্তন পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। (পল্লীপ্রকৃতি, পৃ. ১০৪)

আমাদের অনুমিত দ্বিতীয় কারণটি মাত্রায় ছোট, কিন্তু অন্যদিক থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। পূর্ববঙ্গের গ্রামে দারিদ্র্য থাকলেও, এতটা শ্রীহীনতা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ দেখেননি। সাধারণ কৃষকের বৈভব না থাকলেও পালপার্বণে আনন্দের অভাব হত না। কিন্তু রাঢ়বঙ্গের যে-গ্রামকে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে দেখেছিলেন, তা কিন্তু অনেকটা ভেঙে পড়ার মুখে। রাঢ়ে ভূমিহীন চাষির সংখ্যা বেশি ছিল আর স্বত্ববান রায়তও ছিল নামমাত্র জমির অধিকারী।[৬] বীরভূমের এই গ্রামজীবনের কথা আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যেও পেয়েছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বোলপুর শহরে বেশ কিছু ধানকল গজিয়ে ওঠে আর সেখানে দিনমজুর খাটতে আসে আশপাশের গ্রামের আদিবাসী নারী-পুরুষ। এর ফলে গ্রামজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। বোলপুর গ্রামজীবনের এই ভাঙনের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন; আরও ভালো করে পাই নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দু সমাজের গড়ন'-এ: 'বিভিন্ন শিল্পিকুল দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ ভূমিহীন চাষী বা মজুরে পরিণত হইয়াছে, কেহ দেশত্যাগী হইয়া কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না।'[৭] এই ভগ্ন গ্রামকেই যেন পুনর্গঠিত বা পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে এল্‌মহার্স্টেরও মনে হয়েছিল, প্রধান সমস্যা হল গ্রামের মানুষের উৎসাহ-উদ্যম একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভয়াবহ, অথচ জমা জল পরিষ্কার করতে কেউ আগ্রহী নয়। চাষবাস নিয়ে কোন-রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও তারা নারাজ। নিস্তরঙ্গ, নিরাবেগ গ্রাম যেন ধুঁকতে-ধুঁকতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

১৯২৬ সালে শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে, কালীমোহন ঘোষের পরিচালনায় বল্লভপুর গ্রাম নিয়ে যে-সমীক্ষা হয়, সেখানেও দেখা গিয়েছিল একই চিত্র। গ্রামে মেলা-উৎসব বলে কিছু নেই। পাঠশালাটি

উঠে গেছে। কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকা প্রায় নেই; অথচ বেশির ভাগ লোকই ভূমিহীন এবং ঋণগ্রস্ত। হাড়ি-মুচি-ডোমেরা বোলপুরের ধানকলে যায় দিনমজুরি করতে। পুকুরের জল পানের অযোগ্য। জল আনতে হয় কোপাই নদী থেকে; অথচ ওই নদীতেই লোকে গোরু-মোষ স্নান করায়। গ্রামের একটা বিরাট অংশ জঙ্গল; জায়গায়-জায়গায় জল জমে থাকে। কেউ তা পরিষ্কার করে না।[৮] বোলপুর শহর থেকে মাত্র চার মাইল দূরে এই হল বল্লভপুর গ্রামের অবস্থা।

গ্রামসংস্কার বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন শুধু আর্থিক উন্নয়ন নয়, হতশ্রী গ্রামকে শ্রীমণ্ডিত করে তার পরিবেশকে সুন্দর করে তোলা। 'শ্রী' রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-ভাবনায় তাই একটা বড়ো স্থান অধিকার করে আছে। 'গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ দিয়ে।'[৯]— এই সৌন্দর্য-চেতনাই আলিপ্ত হয়েছিল তাঁর পরিবেশচিন্তায়। এল্‌মহার্স্টের ইনস্টিটিউট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন নাম বদলে তাই রবীন্দ্রনাথ নতুন নাম দিলেন: 'শ্রীনিকেতন'।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'ছিন্নপত্রাবলী', ১৫৩ নং পত্র।

২. 'পল্লীপ্রকৃতি', পৃ. ৪।

৩. 'শান্তিনিকেতন', (পত্রিকা সংকলন) সম্পাদক: সুপ্তি মিত্র, পৃ. ৬২।

৪. রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি পাওয়া যাবে এল্‌মহার্স্টের 'পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান' গ্রন্থের প্রথমে।

৫. উদ্ধৃত হয়েছে, শঙ্খ ঘোষ, 'কবির অভিপ্রায়'; পৃ. ১১৮।

৬. এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখতে পারেন কে. পি. বাগচি প্রকাশিত 'বাংলার কৃষিসমাজের গড়ন' সংকলনে বিনয়ভূষণ চৌধুরী এবং রজতকান্ত রায়ের রচনা; পৃ. ২২-২৩, ৬৬-৬৮।

৭. নির্মলকুমার বসু, 'হিন্দু সমাজের গড়ন', পৃ. ১২২-২৩।
৮. 'রুরাল সার্ভে: বল্লভপুর', সম্পাদনা: কালীমোহন ঘোষ। শ্রীনিকেতন, জুলাই ১৯২৬। এই দুর্লভ প্রতিবেদনটি দেখার সুযোগ পেয়েছি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।
৯. 'পল্লীপ্রকৃতি', পৃ. ৪৬।

* এই রচনাটির কিছু অংশ আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিতর্কিকা' পত্রিকায়।

Shiksha
EDUCATION RESO
62B, Alipore Road,
Ph. : 247
RETURN D

DUE DATE	DUE D

DUI